সংবাদ পরিষেবা | নভেম্বর ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

চন্দ্রাহত! ২৯/৩২

সুব্রত কুণ্ডু

চন্দ্রযান-৩ এর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ, ভারতের মহাকাশ অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতবাসীর এই সাফল্যে মাতাল হওয়া স্বাভাবিক। চাঁদে জলের উপস্থিতি এর আগেই টের পেয়েছিল মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা। বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা, বিভিন্ন সময়ে তাদের গবেষণার মাধ্যমে অনুমান করেছেন, চাঁদের অন্ধকারময় দক্ষিণ মেরুর এবড়োখেবড়ো জমি আর গিরিখাতে, বিভিন্ন রূপে জল রয়েছে। তারই সন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশ সেখানে পৌঁছোনোর চেষ্টা করেছে। ভারত প্রথম দেশ যারা সফল হল।

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে জল। আলাদা আলাদা থাকলে হাইড্রোজেন দাহ্য। প্রচুর তাপ উৎপাদনকারী। সূর্যের ৫৫ শতাংশ গ্যাস হাইড্রোজেন। আর অক্সিজেন মানুষসহ প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার আধার। তাই জলের খোঁজ! ভবিষ্যতের কথা ভেবে! কারণ পৃথিবীর অবস্থা খুব ভাল নয়।

চাঁদ কেন, অজানা সব কিছু নিয়ে বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণা চলুক। চাঁদে, মঙ্গলে মানুষ পাড়ি দিক। কিন্তু নিজেদের গ্রহের ফলিত সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা কী করছি। বিজ্ঞান, গবেষকরা বলছে, মানুষের অপরিসীম লোভে সমগ্র প্রাণীকূল বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তবুও টনক নড়ছে না। অত্যাধিক কার্বন নির্গমনকারী ইন্ধন (জীবাশ্ম জ্বালানি) আর প্রযুক্তির ব্যবহার; লোভের জন্য বেঁচে থাকার আধার প্রকৃতিকে শোষণ; দেশে দেশে যুদ্ধ বাঁধিয়ে আমরা বেশিরভাগ মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করছি। তবে যারা এসবের মূল হোতা— যারা লাভ ও লোভের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সীমাহীন ধন সম্পদ তৈরি করছে— তারা জানে এই বিপদের কথা। মহাপ্রলয়ে টিকে থাকার জন্য কোন মেরুতে, কোন দেশে বা কোন গ্রহে যাবে, তার পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে তারা। কেউ কেউ তো বাঙ্কারও বানিয়ে ফেলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। ডগলাস রাশকফের 'সারভাইভাল অব রিচেস্ট' বইতে যার উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ কী করবে, তারা কোথায় যাবে? উপায় কী বেঁচে থাকার? একমাত্র উপায় লাভ ও লোভের অর্থনীতি, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ। আর এটা যদি আমরা না করতে পারি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। 'ডোন্ট চুজ এক্সটিঙ্কশন' অ্যানিমেশন ছবিতে রাষ্ট্রসংঘের এক অধিবেশনে সবাইকে চমকে দিয়ে এক ডাইনোসর, পোডিয়ামে গিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলছে, আমরা বিলুপ্ত হয়েছিলাম বহিরাগত গ্রহাণুর আঘাতে। আর তোমারা কিনা নিজেরাই, নিজেদের অবলুপ্তির জন্য— জীবাশ্ম পুড়িয়ে, পৃথিবীকে গরম করে, কোটি কোটি টাকা ভরতুকি দিচ্ছ! অদ্ভুত! ৭ কোটি বছরে এমন বোকামো দেখা যায়নি। শোনো অবলুপ্তি খুব খারাপ। আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরই কবর খুঁড়ছ...। সত্যি বুদ্ধিমান মানুষের কী দাপট-নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে চাঁদে, মঙ্গলে বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে...।

মতামত নিজস্ব

জীবাশ্ম জ্বালানিঃ ব্যবহার বেড়েই চলেছে ২৯/৩৩

রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংস্থার (ইউএনইপি) একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন কমানোর

প্রতিশ্রুতি দিলেও, বিশ্বে ২০৩০ সালের মধ্যে এর উৎপাদন দ্বিগুণ হতে পারে। ১৫১টি দেশের সরকার কার্বন নির্গমন শূন্যে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও জীবাশ্ম জ্বালানির উত্তোলন বেড়েই চলেছে। এর ফলে মানব জীবন এবং বিশ্বে জলবায়ু বদলের প্রভাব দ্বিগুণ হবে।

স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউট (এসইআই), ক্লাইমেট অ্যানালিটিক্স, ইথ্রিজি, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট (আইআইএসডি) এবং রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)'র প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে, দেশগুলিকে ২০৪০ সালের মধ্যে কয়লা উৎপাদন এবং তার ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া ২০২০ সালের তুলনায়, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ জীবাশ্ম তেল ও গ্যাস উৎপাদন কমানোর কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২০টি দেশের মধ্যে ১৭টি, নেট-জিরো বা কার্বন নির্গমন শূন্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে - এবং জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন সীমিত করে নির্গমন কমানোর জন্য কর্মসূচিও চালু করেছে। কিন্তু কোনো দেশই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত করার জন্য ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কয়লা, তেল ও গ্যাস উৎপাদন কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়নি। দুই বছর আগে গ্লাসগোতে ২৬ তম কনফারেন্স অফ পার্টিস (কপ-২৬)-এই জ্বালানির উত্তোলন কমানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের মতে, জীবাশ্ম জ্বালানির যুগ শেষের পথে। তাই দুবাইতে অনুষ্ঠিত কপ ২৮ - এ সরকারগুলিকে সময় ধরে এই জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার অঙ্গীকার করতে হবে। আর বিকল্প হিসেবে, বারবার ব্যবহার করা যায় এমন শক্তি ব্যবহার বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

নাড়া পুড়িয়ে মারণ গ্যাস

২৯/৩৪

'কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি এবং পরিবেশ মন্ত্রক পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে নাড়া পোড়ানো একেবারে বন্ধ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য ৪টি রাজ্যকে ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্ট (সিআরএম) প্রকল্পের অধীনে পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করছে'। এবছর অগস্টের সংবাদ পরিষেবায় আমরা একথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু নভেম্বরে এসে দেখা গেল— ৭ নভেম্বর অবধি পাঞ্জাবে ২২,৬৪৪ টি নাড়া পোড়ানোর ঘটনার রেকর্ড করা হয়েছে, যা মোট ঘটনার ৯৩ শতাংশ।

পাঞ্জাবে ধানের খামারগুলিতে অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে প্রায় ৭০-৮০ লক্ষ মেট্রিক টন নাড়া পোড়ানো হয়। এতে কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোজেন, উদ্বায়ী জৈব যৌগ তৈরি হয়। এই দূষণের এত প্রভাব যে, পাঞ্জাবে নাড়া পোড়ানো হলে দিল্লির মানুষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বেশ কিছুদিন স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বন্ধ রাখতে হয়। এবছরও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। আগে দিল্লি এবং পাঞ্জাব সরকার একে অন্যকে দোষারোপ করত। কিন্তু এখন এই দুই রাজ্যে একই দলের সরকার থাকা সত্ত্বেও নাড়া পোড়ানো বন্ধ করা যাচ্ছে না।

ফেরত আসছে বিষাক্ত ফসল

২৯/৩৫

২০১৮'র ডিসেম্বর বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক ভারতের কৃষি সামগ্রী রফতানি বাড়াতে একটি বিস্তৃত নীতি চালু করেছিল। এই নীতির লক্ষ্য ছিল, ভারতের কৃষি রফতানি দ্বিগুণেরও বেশি করা। অর্থাৎ ২০১৮ সালের ৩০০০ কোটির কৃষি রফতানি বাণিজ্য ২০২২-এ ৬০০০ কোটি মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ফসলে কীটনাশক ও নানা রাসায়নিকের অবশেষ, ভারতের কৃষি রফতানির জন্য চিন্তার প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে, উচ্চমাত্রায় রাসায়নিক অবশেষের উপস্থিতির জন্য, বেশ কয়েকটি দেশ ভারতের কৃষিপণ্য নিতে অস্বীকার করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২২ সালে অত্যাধিক কীটনাশকের অবশেষ থাকায়, ভারত থেকে কৃষিপণ্যের ৬৭৫ টি চালান ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্তে আটকে দেওয়া হয়। ২০২১ সালে একইভাবে ২১২ টি চালান ইউরোপের দেশগুলি

প্রত্যাখান করেছিল। ভারতের জিরের সব থেকে বড় ক্রেতা চিন। ২০২১ সালে চিন কীটনাশক অবশেষের কারণে প্রায় ১৩ শতাংশ কম জিরে রফতানি হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশ কীটনাশকের কারণে আম, আঙুর, ঢেঁড়শ, চিনেবাদাম, কারিপাতা, লঙ্কা এবং তেঁতুলের চালান নিতে অস্বীকার করেছে। এতে চাষিদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশনস এর ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশ কৃষিপণ্যে থাকা বিষ যাচাই করার কাজ অনেকটাই বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত বেশ পিছিয়ে। সরকার স্বীকার করেছে, চাষিদের আয় দ্বিগুণ করতে কৃষি রফতানি অপরিহার্য। আর এর জন্য সরকারকেই সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে, চাষে কীটনাশক বন্ধ করতে।

এই কারণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক ডঃ অনুপম ভার্মার সভাপতিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটি নিষিদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ ৬৬টি কীটনাশকের ব্যবহার পর্যালোচনা করে। উল্লেখ্য, এর মধ্যে অনেকগুলি কীটনাশকই একাধিক দেশে বাতিল করা হলেও ভারতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কমিটির সুপারিশে সরকার কিছু কীটনাশক নিষিদ্ধ করার জন্য দুটি খসড়া আদেশ পাস করেছে। কিন্তু এগুলি বেশিরভাগ মানুষই জানে না। সবথেকে খারাপ কীটনাশক— যা মানব স্বাস্থ্য বা পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী বিপদের কারণ হিসেবে পরিচিত— সেগুলির ব্যবহার এখনো অবধি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আর তাই আমাদের কৃষিপণ্য কেউ নিতে চাইছে না।

টান পড়ছে ভূজলে

২৯/৩৬

চাষে জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জলের অভাব হলে চাষিদের ভূমির নীচের জল বা ভূজলের ওপর নির্ভর করতে হয়। সারা বিশ্বে ৪০ শতাংশ কৃষি নির্ভর করে ভূজলের ওপর। ভূজল যেহেতু সীমিত, তাই সময়ের সঙ্গে এই জল কমে যায়। ভারতের খাদ্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত পাঞ্জাব। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এই রাজ্যে ভূজলের টান পড়ছে।

এখানকার চাষি ভূজলের ওপর বেশি নির্ভরশীল। ভূজল পেতে তাই প্রায়শই আরো গভীরে খনন করতে হয়। এটা শুধু ভবিষ্যতের চাষের সমস্যা তৈরি করছে তা নয়। ভূজল ব্যবহার করা খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু এই রাজ্যের চাষিদের হাতে কোনো বিকল্প নেই। ভূজলের তল নীচে নেমে যাওয়ায় শুধু ক্ষেতের মালিকরাই নয়, সকলেরই ক্ষতি। কারণ পানীয় জলের উৎসও এই ভূজল।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও তথৈবচ। বিশেষ করে বোরো মরশুমে চাষের জন্য এত ভূজল তুলে নেওয়া হয় যে, মার্চ মাসের পর থেকে পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। এর সঙ্গে আর্সেনিক, ফ্লরাইড দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। আর্সেনিকের অবশেষ ধানেও দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান কৃষি, জলবায়ু আর পারম্পরিক চাষ

২৯/৩৭

পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পুষ্টির সুযোগ পাওয়া একটি মৌলিক মানবাধিকার। তবুও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিশুদ্ধ জল পায় না। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়। লক্ষ্য হল, প্রত্যেকের নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাবারের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য টেকসই কৃষি এবং খাদ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা। তবে এই 'দিবস' ধুমধাম করে পালন হলেও, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই খাবারের অভাবও পূরণ হচ্ছে না। টেকসই কৃষি তো দূর অস্ত। উদাহরণ হিসেবে ভারতের অবস্থাই ধরা যাক— ভারত, জলবায়ু বদলের হিসেবে সপ্তম-সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। কাউন্সিল অন এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতের প্রতি ৪টি জেলার মধ্যে ৩টি হল চরম জলবায়ু ঘটনার হটস্পট। এই জেলাগুলিতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা ও তাপপ্রবাহের ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং তার তীব্রতা দেখা যায়।

দারিদ্র ও প্রান্তিক, বিশেষ করে নারীরা জলবায়ু সংকটের অসম ভার বহন করে। ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়ার একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে জলবায়ু বদলের ফলে প্রভাবিত এবং উদ্বাস্তু পরিবারের মহিলাদের কমপক্ষে ১২-১৪ ঘন্টা বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতে হয়। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে, প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে বাদ দিয়ে— বৈশ্বিক বা জাতীয় স্তরেই হোক— বর্তমান সমাধানগুলি জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এর ফলে পারম্পরিক জ্ঞান, উপলব্ধি, সম্পদ ব্যবহার হচ্ছে না । ফলে কৃষিসহ অন্য সব কিছুই টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না।

ভারতে গোণ্ড যুগে অধিকাংশ লোকের জীবিকার ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। গোণ্ড রাজাদের দ্বারা নির্মিত অধিকাংশ পুকুর ছিল খালবিহীন। এর অর্থ সেই জল সাধারণত সেচের কাজে ব্যবহার হত না। তবে মূলত আর্দ্রতা এবং ভূগর্ভস্থ জলের তল বৃদ্ধি, জলবায়ু ভারসাম্য বজায় রাখা, নির্ভরযোগ্য পানীয় জলের উৎস বজায় রাখা এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য মাছ ধরা, জলে হয় এমন ফসল চাষ হত। মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর, জব্বলপুর, সাগর ও দামোহ জেলায় গভীর কালো মাটিতে আর্দ্রতা সঞ্চয় করার এবং এর ভিত্তিতে সেচ ছাড়াই, রবিতে ভাল ফসল পাওয়ার দেশীয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

এ রাজ্যের পুরুলিয়ার মত শুখা জেলার বিভিন্ন অংশে শিশিরের জল সঞ্চয় করে আখের চাষ করা হত। এরকম উদাহরণ এখনো বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে। প্রকৃতি এবং জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখা এইসব পারম্পরিক ব্যবস্থা ভুলে আমরা তথাকথিত উৎপাদনমুখী সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছি। এতে নির্দিষ্ট কিছু ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু বিষিয়ে গেছে জল, হাওয়া, মাটি। উৎপাদন বাড়লেও তা মানুষের হাতের বাইরে চলে গেছে। সমাজবিজ্ঞানী, অর্থশাস্ত্রীরা বারবার দেখিয়েছেন, বেশি উৎপাদন হলেই সবার কাছে খাদ্য পৌঁছোবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ খাদ্য উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ হয়ে গেছে। এছাড়া বেশি উৎপাদনের তাড়নায় জমি, জল, হাওয়া বিষময় হয়ে ওঠায় নির্মল খাদ্য পাওয়ার সুযোগ করেছে। কিন্তু পারম্পরিক ব্যবস্থায় উৎপাদন স্থানীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই চাষ টেকসই হয়। উৎপাদন, বন্টন সবই স্থানীয়ভাবে হতে পারে, এর ফলে পরিবেশও বিষাক্ত হয় না।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু